বৌদ্ধ ধর্ম কেন ?

ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ
নায়ক মহাথের

শ্রী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া
অনূদিত

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। বিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক র "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে ওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র দ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের ছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা ম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mottrijagat Bhante

WHY BUDDHISM

By

Dr. K. Sri Dhammananda

Nayaka Mohathero

বৌদ্ধ ধর্ম কেন?

ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের

শ্রী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া অনূদিত

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

সোসাইটি পুস্তিকা-১

WHY BUDDHISM

By

Dr. K. Sri Dhammananda

Nayaka Mohathero

ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের রচিত

বৌদ্ধ ধর্ম কেন?

শ্রী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া অনূদিত

প্রথম সংস্করণ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১লা বেশাখ ১৩৮৮

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ বাংলা

প্রকাশনায়

পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রযত্নে - নালন্দা লাইব্রেরী

১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ সহযোগিতায়

রাজবান কম্পিউটার

১২, জি.এ. ভবন (২য় তলা),

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বিনিময় ঃ সাত টাকা

উৎসর্গ

পরলোকগত মহিয়সী নারী

শ্রীমতি সুপ্রিয়া বড়ুয়ার

পারলৌকিক মঙ্গল কামনায়

সুর-শ্যাম কল্যাণ ট্রাষ্টের পক্ষে

বিজয়, রণজয়, বাণী ও অজয়।

শ্রীমতি সুপ্রিয়া বড়ুয়া
(১৯২৪–২০০০)

শ্রীমতি সুপ্রিয়া বড়ুয়া রাউজান থানার রাউজান গ্রামের ধনাঢ্য মহেশ সওদাগর বাড়ীর প্রয়াত সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার প্রথম কন্যা, জন্ম ১৯২৪ সাল। মহেশ সওদাগরের উদ্যোগ ও দানে প্রতিষ্ঠিত হয় আর্য মৈত্রেয় বৌদ্ধ বিহার এবং আর্য মৈত্রেয় ইনষ্টিটিউশন। পারিবারিক ধর্মীয় ও শিক্ষার পরিবেশে সুপ্রিয়া বড় হন এবং বয়ক্রমে ফটিকছড়ি থানার হাইদচকিয়া গ্রামের বনেদী মহাজন বাড়ীর যুবরাজ মহাজনের পুত্র শ্রী নৃপেন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নৃপেন্দ্র বিজয় একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও সমাজকর্মী। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ফটিকছড়ি করোনেশন স্কুলের সাম্মানিক শিক্ষক ও পরবর্তীতে নাজিরহাট কলেজের শিক্ষক। সমাজকর্মী হিসেবে তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, বাংলাদেশ বুডিষ্ট ফাউণ্ডেশন, পালি বুক সোসাইটি, হাইদচকিয়া হাই স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষা সেবা ও ধর্মীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

স্বামীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্ত্রী সুপ্রিয়ার ছিল অসামান্য অবদান। তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরলস কর্ম তৎপরতার গুণে নৃপেন বাবু বৃহত্তর সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তারই তত্ত্বাবধানে ও সুশৃঙ্খল পরিচালনায় তাঁদের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুন্দর পারিবারিক জীবন পরিচালনা করছেন। স্বামীর সমাজ সেবার সুমহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশান্তি প্যাগোডার ছাত্রাবাসে কক্ষদান, হাইদচকিয়া হাই স্কুলের বিজ্ঞান ভবন নির্মাণে সহায়তা, বাংলাদেশ বুডিষ্ট ফাউন্ডেশনে 'যুবরাজ-নৃপেন্দ্র স্মৃতিবৃত্তি' ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান 'নালান্দা' লাইব্রেরীতে পালি বুক সোসাইটির পুস্তক বিপনী ও প্রচারণায় সুযোগ দেন।

পরোপকারী মহিয়সী শ্রীমতি সুপ্রিয়া বড়ুয়া বার্ধক্যজনিত কারণে ৩০শে মে, ২০০০, মঙ্গলবার রাত ১২.১৫ টায় চট্টগ্রাম মাউন্ট হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং পরদিন গ্রামের বাড়ীতে তাঁর শেষকৃত্যানুষ্টান সম্পন্ন করা হয়।

আমরা তাঁর পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করছি।

চট্টগ্রাম, পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭
৬ই জুন, ২০০০

প্রকাশকের বক্তব্য

বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার লক্ষ্যে ২৪শে মার্চ, ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার মিলনায়তনে এক সাংগঠনিক সভায় পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ প্রথম আত্ম প্রকাশ করে। উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনেক নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব। উক্ত সভায় বিহারের উপাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শীলাচার শাস্ত্রীকে সভাপতি, শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়াকে সাধারণ সম্পাদক, শ্রী অজিত বরণ বড়ুয়াকে সহকারী সাধারণ সম্পাদক, শ্রী তেমিয় কুমার বড়ুয়াকে কোষাধ্যক্ষ ও ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, ডাঃ সামন্ত ভদ্র মুৎসুদ্দী, শ্রী অমলেন্দু বড়ুয়া, শিক্ষক শ্রী ভূপতি বড়ুয়া, শিক্ষক শ্রী নীলাম্বর বড়ুয়া ও শ্রীমতি চারুবালা বড়ুয়াকে সদস্য করে সোসাইটির পথম কমিটি গঠন করা হয়। সভায় প্রবীণ সমাজকর্মী শ্রী নৃপেন্দ্র বিজয় বড়ুয়া প্রকাশনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সহযোগীতা দানের আশ্বাস দিয়ে সবাইকে উদ্দীপ্ত করেন।

সোসাইটির প্রথম পুস্তক ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের রচিত Why Buddhism অজিত বরণ বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত হয়ে ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের উপস্থিতিতে অনুষ্টিত এক প্রকাশনা উৎসবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই শুভ যাত্রার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৯টি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়ার অর্থানুকুল্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১লা বৈশাখ ১৩৮৮ বাংলা। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয় তাঁদের পারিবারিক সংগঠন 'সুর-শ্যাম কল্যাণ ট্রাষ্ট' এর আর্থিক সৌজন্যে। সহৃদয় দাতাবৃন্দের এই অনন্য দৃষ্টান্ত অনুসরণে আমাদের প্রকাশনাকে আরো শক্তিশালী করবে।

চট্টগ্রাম, **পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।**
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭
৬ই জুন, ২০০০

অনুবাদকের কথা

বৌদ্ধ ধর্ম মুক্ত চিন্তার ধর্ম। বুদ্ধ মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন। এই স্বাধীনতা অবশ্যই যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। মানুষের মধ্যে যুক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে স্বাধীনতা চর্চায় কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রান্ত মতবাদ, পরম্পরাগত রীতিনীতি ও ধর্মের গোঁড়ামি স্থান করে নিতে পারে। তাই বুদ্ধ অনুসন্ধান ও উপলব্ধির জন্য মানুষকে স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। যুক্তিহীন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন কিছু গ্রহণ করলে সত্য উপলব্ধি কঠিন হয়ে উঠে এবং এটা মানুষকে অন্ধ অনুগামী করে তোলে।

প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা বৌদ্ধ ধর্ম দিয়েছে। ধর্ম নির্বাচনের জন্য শিক্ষক বা ধর্মীয় নেতার কতৃত্বের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার জন্য বুদ্ধ নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। তিনি কখনো বলেননি যে তাঁকে দর্শন করলে, পূজা দিলে, প্রার্থনা করলে, কেউ ত্রাণ লাভ করবেন বা পাপ হতে মুক্তি পাবেন বা স্বর্গলাভ করবেন। তিনি সকল প্রকার অকুশল কর্ম ত্যাগ করে কুশল কর্ম সম্পাদন পূর্বক আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিয়েছেন।

অন্য ধর্মানুসারীদের কাছ থেকে প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হই। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সেসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না, অনেক সময় আমরা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাই বা ভুল ব্যাখ্যা দিই। মালয়শিয়ার নায়ক মহাথের ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ কৃত Why Buddhism পুস্তিকায় বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বিষয় বা ধারণার সুন্দর ব্যাখ্যা দেখে বইটির ভাষান্তরে অনুপ্রাণিত হই। পালি বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া বইটি প্রকাশ করেছেন। এই জন্যে তাঁকে এবং সোসাইটির সকল সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই।

বেতাগী, চট্টগ্রাম
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭
৬ই জুন, ২০০০

জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া

বুদ্ধ বাণী

'হে ভিক্ষুগণ, আমি দৈব বা জাগতিক সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত। ভিক্ষুগণ, তোমরাও দৈব বা জাগতিক সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত।'

'হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি করুণাবশত দেব-মানবের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য ও সুখের জন্য তোমরা বিভিন্ন পথে বিরচণ করো .... দুইজন এক পথে যেও না। ভিক্ষুগণ যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তিমে কল্যাণ, সেই ধর্ম দেশনা করো। সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ পবিত্র ধর্ম প্রচার করো।'

'দৃষ্টিক্ষীণ সত্তগণ ধর্ম শ্রবণ না করেই বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর অনেক সত্ত ধর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম।'

ভূমিকা

অতীব আনন্দের সাথে আমি বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে এই অসাধারণ পুস্তিকাখানি পাঠ করেছি। এর প্রতিটি ছত্র পাঠকের বিষন্ন অন্তরকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত অথচ প্রধান দু'টি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেয়া হয়েছে– ধর্ম কেন? এবং বৌদ্ধ ধর্ম কেন? পুস্তিকার পাতায় বৌদ্ধধর্মের বর্ণাঢ্য চিত্রকে স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে যা সৃজনশীলতায় শিল্পীর কল্পনাকেও অতিক্রম করেছে। পুস্তিকাটি বার বার পাঠে কৌতুহলী পাঠকের মনে নূতন নূতন বিষয় উদিত হয়। এতে লিখিত বিষয় সমূহ সুষম ও সত্য সমৃদ্ধ। মালয়শিয়ার প্রধান বৌদ্ধ নায়ক মহাথের হিসেবে লেখকের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং খ্যাতিমান বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে তাঁর বিজ্ঞোচিত ও পবিত্র জীবনই সংক্ষিপ্তাকারে এ ধরনের উপকারী ও নির্দেশমূলক একটি পুস্তিকা রচনার জন্য তাঁর অর্জিত যোগ্যতা। 'বৌদ্ধ ধর্ম কেন ?' এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এখানে দেয়া হয়েছে।

ডিকওয়েলা পিয়ানন্দ এম,এ; পিএইচ,ডি।
(Dikwela Piyananda)
বৌদ্ধ বিহার
৫০১৭, ১৬তম ষ্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডি সি ২০০১১
ইউ, এস, এ।

বৌদ্ধ ধর্ম কেন ?

ধর্মের ভিত্তি

'বৌদ্ধ ধর্ম কেন' বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে মানুষের ধর্মচিন্তা কবে থেকে প্রথম শুরু হয়।

হাজার হাজার বছর পূর্বে আদিম মানব প্রকৃতির অস্বাভাবিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করে অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তার প্রতিকূলে গেলে সে কষ্ট পায়, দুর্দশাগ্রস্থ হয়। সে দেখতে পায় ধ্বংস ও আকস্মিক ঘটনাবলী সন্দেহ, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা, কষ্ট ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। তখন থেকে সে এর সমাধান এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এসব ঘটনাবলী তার বোধশক্তির বাইরে। তাই সে কল্পনা করতে থাকে এসবের পেছনে নিশ্চয়ই অদৃশ্য শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা বা কোন ব্যক্তি আছে। এই ক্রুদ্ধ শক্তিকে শান্ত করতে সে তখন থেকে পশুবলি দিতে শুরু করে। কিছু কিছু প্রাকৃতিক শক্তি তার অনুকূলে গেলে এটা দেবতার কাজ মনে করে সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তখন এসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং আপদ বালাই থেকে মুক্তি লাভ। এভাবে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলন আরম্ভ হয় এবং আদিম মানবের প্রার্থনা ও আরাধনার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন ধর্মভাব বিকাশ লাভের সাথে সাথে আরো কিছু আনুষঙ্গিক অভ্যাস এর সাথে যুক্ত হয়, যেমন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, আনন্দ উৎসব ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে এই অভ্যাস থেকে সৃষ্টি হয় বিশেষ ধরনের রীতিনীতি, মতবাদ এবং অঞ্চল ও দেশে প্রচলিত বিশেষ জীবন ধারা।

মানুষ তার মৌলিক ও অন্তর্নিহিত ভয়, নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই ধর্মের ভিত্তি রচনা করেছে। মানুষের ভয়ই ধর্মের কঠিন দেয়াল হিসেবে কাজ করেছে। এটা শুধু ধর্ম সমূহের ভিত্তি দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, ধর্মের ইমারত

নির্মাণের মূল উপাদান যেমন, ইট, পাথর, বালি ও সিমেন্ট হিসেবেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

যা হোক, বিশ্বাস সৃষ্টির মধ্য দিয়েই ইমারত রূপ ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিশ্বাসের সাথে প্রবর্তিত হয়েছে নৈবেদ্য, বলিদান, প্রার্থনা, ধর্মীয় অঙ্গীকার, শাস্তি, নিয়ম-নীতি – সবই ধর্মের নামে। তাছাড়া মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নন্দন-কাননের মত শাশ্বত পরম সুখের স্থানের নিশ্চয়তাও এতে ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি

পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম কি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তা পর্যালোচনায় দেখা যায় বুদ্ধ পুরানো সেই ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেননি। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের ধারণা, আত্মার তত্ত্ব, শাশ্বত স্বর্গ বা শাশ্বত নরকের ধারণা প্রবর্তন করেননি। তাঁর ধর্মকে সমর্থনের জন্য তিনি মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করেননি বা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে অলৌকিক বলে বিকৃত অর্থ করেননি। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হতে বা অপ্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান করতে বলেননি। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিগ্রহ, শাস্তি-আরোপ বা অনুশাসনে বিশ্বাস করতেন না। সবচেয়ে বড় কথা তিনি কোন রকম দৈব অনুগ্রহ বা দেব- প্রত্যাদেশের সন্ধান করেননি। তিনি এই ধর্মীয় ইমারত গড়ার জন্য সম্পূর্ণ নূতন উপাদান ব্যবহার করলেন, যেমন – জীবন, জগত, প্রকৃতির আকস্মিক ঘটনাবলী অথবা মহাজাগতিক নিয়মাবলী, মন ও বস্তু, উপাদান ও শক্তির বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, শৃঙ্খলাবোধ, মানসিক প্রশিক্ষণ ও পবিত্রকরণ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিকে সঠিক দৃষ্টিতে দর্শন ও মূল্যায়ন। এটা সত্যি যে তিনি তদানীন্তন ধর্মানুসারীদের কিছু কিছু বিষয় ব্যবহার করেছেন, যেমন - ধর্ম, সদ্‌জীবন, কর্ম ও কর্মফল, পুনর্জন্ম এবং কিছু কিছু নৈতিক নিয়ম। এসব তিনি ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তিনি বিষয়গুলোকে পরিশীলিত করে আরো যুক্তিগ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রবর্তন করেন।

একটি আত্মনির্ভরশীল ধর্ম

বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রিত মতবাদের সংগ্রহসার নয়। এর আছে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি। অন্য কোন ধর্মগুরু অখণ্ড সত্য এবং মানুষের চরম মুক্তির সন্ধান দিতে পারেননি বুঝতে পেরে বুদ্ধ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁরা শুধু কিছু কিছু জাগতিক ক্ষমতার অগ্রগতি সাধন করেছেন এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কিছু ধাপ অতিক্রম করতে পেরেছেন কিন্তু মনের পূর্ণ পরিশুদ্ধতা বা পরম মুক্তি অর্জন করতে পারেননি। তাঁরা অন্ধবিশ্বাস, কলুষতা, অবাস্তবতা, মায়া-মরীচিকা ও অজ্ঞতা মুক্ত নন। তাহলে ধর্ম বলতে আসলে কি বুঝায়?

বুদ্ধ প্রবর্তিত 'মহান জীবনের ধর্মের পথ' পর্যালোচনা করলে ধর্মের প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে পারব। বুদ্ধের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি আমরা 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি, তখন আমরা অন্যান্য ধর্মনিষ্ঠদের দেয়া এর বিভিন্ন সংজ্ঞা অবশ্যই বুঝতে পারব। তখনই আমরা আরো বেশী উপলব্ধি করতে পারব, বৌদ্ধ ধর্ম কেন প্রয়োজন।

ধর্মের গোঁড়ামি নয়

মানুষের মনে গ্রথিত হাজার বছরের ভ্রান্ত বিশ্বাস বুদ্ধ নিরসন করতে সমর্থন হন। যেমন তখনকার দিনে মানুষ বিশ্বাস করত যে সূর্য প্রতিদিন পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। সৌরজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে মানুষ এটা বিশ্বাস করত। পোলান্ডের জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস আবিষ্কার করে যখন প্রমাণ করলেন যে সূর্য প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে, তখনই কেবল মানুষ এই তত্ত্বের সত্যতা বুঝতে পারে এবং ক্রমে পূর্বের ভুল ধারণা ত্যাগ করে।

পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের অন্য এক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে তারা বিশ্বাস করে আসছে যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা। তখন ইতালীয় জ্যোতির্বিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও আবির্ভূত হলেন, তিনি আবিষ্কার ও প্রমাণ করলেন যে পৃথিবী মোটেই চ্যাপ্টা নয়, গোল। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে চার্চের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ পেল। গ্যালিলিওকে রোমান ক্যাথলিকদের বিচারালয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বিজ্ঞানীকে তাঁর পূর্বেকার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয় এবং তাঁকে শাস্তিস্বরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এর অনেক পরে মানুষ তাঁর আবিষ্কৃত সত্য গ্রহণ করে।

উনিশ শতক পর্যন্ত দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন যে এটম বস্তুর অপরিহার্য সত্তা যার বিভাজন সম্ভব নয়। পরমাণু বিজ্ঞানীরা যখন এটমকে বিভাজন করতে সক্ষম হলেন তখন তাঁরা তাদের পূর্বের তত্ত্ব পরিত্যাগ করেন। তদ্রূপ প্রাচীন ভারতের হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকেরা বিশ্বাস করে আসছেন যে আত্মা ঈশ্বর সৃষ্ট অপরিবর্তনীয় স্থায়ী সত্তা। বুদ্ধ যখন প্রমাণ করলেন যে, এটা কাল্পনিক ধারণা, তখন তাঁরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস এখনও মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যেমন পরিষ্কারভাবে চাক্ষুষ দেখা রংধনুর বাস্তবতা, প্রকৃত পক্ষে যার কোন স্থায়ীত্ব নেই। বুদ্ধ বুঝিয়ে দিলেন আত্মার ধারণা মানুষের সচেতন মনে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। যদি আত্মা বলে কিছু থাকত, বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে এই তত্ত্ব প্রকাশ না করার কি কোন কারণ থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। বিশেষ করে আত্মার ধারণা অন্যান্য প্রতিটি ধর্মীয় অনুসারীদের কাছে যখন বিরাট গুরুত্ব বহন করে।

চার্লস ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরই প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তখনকার এই জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন। ভূতত্ত্ববিদ্যা, জীববিদ্যা ও শারীরবৃত্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের সযত্ন পাঠে বুঝা যায় বিবর্তনবাদের আধুনিক এই তত্ত্বের সাথে বৌদ্ধধর্মের কোন দ্বন্দ্ব নেই। খনিজ ভাণ্ডার, উদ্ভিদ জীবন ও অন্যান্য প্রাণীর ক্রম বিবর্তনের সাথে বুদ্ধের প্রাচীন মতবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাণের অস্তিত্ব কিভাবে এল, বুদ্ধ এই প্রশ্নের সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রাণ হল মন ও বস্তুর (নামরূপ) সমন্বয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সমবায়ে মন (নাম – চিত্তের চৈতসিক অবস্থা) গঠিত হয়। আর বস্তুকে (রূপ) তিনি

চারটি উপাদানে বিশ্লেষণ করলেনঃ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিষয়ে তিনি যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করেছেন, শুধু এ জগত নয় অন্যান্য গ্রহেও সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান এই দুই শ্রেণীর প্রাণের অস্তিত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

এ যুগের বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদদের মন উন্মুক্ত এবং তাঁরা অন্যান্য গ্রহেও জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন।

জাগতিক নিয়ম ও প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন এবং ঐতিহ্যগত ধর্ম বিশ্বাসও ঠিক পূর্বেকার দিনের প্রাক্ বিজ্ঞানযুগের বিশ্বাসের অনুরূপ। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচীনযুগের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধের শিক্ষা আধুনিক আবিষ্কারের সমজাতীয়। বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় দাসত্বের বন্ধন থেকে মানবতার মুক্তি। তাঁর সামাজিক প্রভাবও ছিল অপরিসীম। তিনি মহিলাদের মর্যাদা উন্নয়নের জন্য তাদেরকে তাঁর সংঘে যোগদানের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তথাকথিত নিচুবর্ণের লোকদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি সমাজে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁদের উপর আরোপিত বাধানিষেধ রহিত করে বুদ্ধ তাদেরকে পূর্ণ ভিক্ষু মর্যাদায় তাঁর সংঘে দীক্ষা দেন।

তখন প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে মুক্তিলাভের জন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে অনুশীলন ও পালন করতে হবে, বুদ্ধ এই ধারণা দূরীভূত করলেন। তাঁর শিক্ষা অনুসারে নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করণই পরম মুক্তি অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন যে ধর্মানুসারী হতে হলে মানুষকে নির্দোষ, সরল, সম্মানিত, মহান ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। কেবল প্রার্থনা করলে বা দান দিলে কেউ ধার্মিক হতে পারে না বা সর্বজ্ঞতা ও মুক্তি অর্জন করতে পারে না।

তিনি মন্দ আচরণ থেকে সকলকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ঈশ্বরের ভয়ে বা তাঁর শাস্তির আশংকায় ভীত হয়ে নয় বরং সকল প্রাণীর মংগলের জন্য সকল অকুশল কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি সকল মানসিক গুণের

উৎকর্ষ সাধন, কুশলকর্ম অনুশীলন এবং নিঃস্বার্থভাবে সকলকে সাহায্য করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

বুদ্ধই স্পষ্টতঃ একমাত্র ধর্মীয় গুরু যিনি মানবিক বিচার বুদ্ধিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। বাইরের সকল মাধ্যমের দাসত্বমুক্ত হয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মানুষই জগতের সবকিছুর জন্য দায়ী। সুখ-দুঃখ দুটোই মানুষের নিজের সৃষ্টি, এবং দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের ক্ষমতাও তার আছে। বাইরের কোন শক্তির উপর নির্ভর না করে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাথে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ সুখ-শান্তি রক্ষার বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে। মানুষের প্রশিক্ষণহীন মনই সকল প্রকার দুঃখ বিপর্যয়, উপদ্রব, প্রতিকূল অবস্থা এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী। একই সাথে মানুষ যদি নিজের মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে তবে সে পৃথিবীর দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী এবং বাসোপযোগী সুন্দর এক জগত গড়ে তুলতে পারে। মানুষের সৃষ্ট সমস্যাবলী অবশ্যই মানুষকেই সমাধান করতে হবে। অন্তর্নিহিত শক্তিকে পরিশুদ্ধ করণের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।

বাস্তবের মুখোমুখি

কাল্পনিক ভাবধারার উপর নির্ভর না করে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সত্যকে গ্রহণ করাকে বৌদ্ধধর্ম উৎসাহিত করে। তাই জাগতিক বিষয়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত সত্যকে বৌদ্ধধর্ম কখনো বাতিল করে না। বুদ্ধ যদিও নৈতিক উৎকর্ষের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তবু তিনি মানুষের সাংসারিক উন্নতির বিষয়কে অবহেলা করতেন না। মহামূল্যবান সময় ও শক্তি অপচয় না করে মানবজাতির উন্নতির জন্য কি করে সুন্দর এবং সুবিবেচনার সাথে কাজ করতে হয় তিনি এসব বিষয়ে নিখুঁত ও বাস্তবভিত্তিক উপদেশ দিতেন। তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক লোকেরই পরিবার,

আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, দেশ ও জগতের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত।

সুতরাং এ পৃথিবীকে আরো সুখময় ও শান্তিময় করে গড়ে তুলতে বৌদ্ধদেরও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখার দায়িত্ব নেয়া উচিত। সরকারের কাজে বা যুক্তিসংগত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কখনও বাধা দেননি। তিনি সামাজিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্য বিরোধী ছিলেন না যতক্ষণ না তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয় এবং সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হয়।

আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অনেক রাজা-মহারাজা ও অমাত্যবর্গ বুদ্ধের শিষ্য হওয়া সত্বেও বুদ্ধ নিজের আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচারের জন্য কখনও ব্যক্তিগতভাবে রাজশক্তি বা সামাজিক শক্তির আশ্রয় নেননি।

বৌদ্ধ ধর্মীয় জীবন ধারা অন্যদের সুখ সুবিধার প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য এবং মানবতার দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার শিক্ষা দেয়। এই ধর্ম কোন অদৃশ্য শক্তির অলৌকিক নির্দেশে নয় বরং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় নীতি বা শৃঙ্খলা পালনের জন্য উপদেশ দেয়। নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী এসব সুন্দর নীতিমালা প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে ত্রুটিমুক্ত করার সুযোগ পাই এবং অন্যদেরকেও শান্তিতে জীবন যাপনের জন্য সহায়তা করতে পারি।

মুক্তিলাভের পূর্বে এ ধরণের পরিপূর্ণতা বা ত্রুটিমুক্ত জীবনই প্রত্যেকের চরম লক্ষ্য। কোন দৈবশক্তিতে বা ঈশ্বরের প্রভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় না।

এসো এর ফল এখনই পর্যবেক্ষণ করি

বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে আমরা এ জীবনেই আমাদের প্রায় সকল ভাল ও মন্দ কাজের ফল দেখে যেতে পারি। এই জীবনকালেই স্বর্গসুখ বা নির্বাণসুখ ভোগ করা যায়। মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।

এজন্যে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম শিক্ষা পদ্ধতি নিজেকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং পালনের জন্যে সকলকে সাদর আহবান জানিয়েছেন। তিনি কাউকে হঠাৎ করে এসে এতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য বলেননি।

তিনি সঠিক ধর্ম কিভাবে নির্বাচন করতে হয় সবাইকে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আবেগ ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু গ্রহণ না করে বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করে প্রকৃত ধর্ম নির্বাচন করতে হয়। অবশ্য সকল ধর্মই 'বিশ্বাস'কে উৎসাহিত করে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসের অর্থ অজ্ঞাত বিষয়ের কাছে আত্ম সমর্পন নয়, ভয় ও শাস্তির নিকট নতি স্বীকার করাও নয়; বৌদ্ধ বিশ্বাস হল সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধানের পর নির্ভীক স্বীকৃতি। এজন্যে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্লেষণমূলক মতবাদ। এই ধর্মে আছে নাম রূপের (মন ও বস্তু/দেহ) বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্বমূলক নিগূঢ় বিশ্লেষণ যা প্রখ্যাত আধুনিক চিন্তাবিদদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

বিশ্ব বিধান

বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ সম্বন্ধে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বলেছেন, সৃষ্টির প্রথম কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ ব্যাপার কেননা জগতের সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অন্যান্য অনেক বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর হেতু হিসেবে যা বর্তমানে কাজ করে তাই ভবিষ্যতে ফল হয়ে দেখা দেয়, পরে সেই ফলই আবার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। অনন্তকাল ধরে এ অসাধারন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একে বলা হয় অনিত্যতা (অনিচ্চ) বা অস্থায়ীত্বের সার্বজনীন নিয়ম।

পৃথিবীর উৎস সম্বন্ধে বুদ্ধ দাবী করেননি যে এটা বৌদ্ধ ধর্মের স্বত্ব এবং চলমান জগত ও সকল প্রাণী বৌদ্ধনীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে;– এসবই নিয়ন্ত্রিত হয় সার্বজনীন বা প্রাকৃতিক নিয়মে। মানুষ পৃথিবীতে শুধু তার নিজস্ব অবস্থানকে মেনে নেবে এবং নিজেকে ও সজীব ও নির্জীব অন্যান্য

সকল বিষয়কে মিশ্র উপাদান বলে বিবেচনা করবে। বিখ্যাত পণ্ডিত ড. রিস ডেভিডসের মতে 'প্রত্যেক লোকের মধ্যে, কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের সম্পর্ক প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, তাই লাগাতা দুই ক্ষণের জন্যেও এটা একই অঙ্গ থাকে না। ফলত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে বিগঠন, বিভাজনও শুরু হয়, একত্র না হয়ে স্বতন্ত্র হতে পারে না, স্বতন্ত্র পরিণতি ছাড়া একত্র হয় না, পৃথকীকরণ ছাড়া পরিণত হতে পারে না এবং বিগঠন, ধ্বংস ছাড়া স্বতন্ত্র পরিণতি হয় না, যা আগে বা পরে অনিবার্যভাবে সম্পূর্ণ হয়।'

বুদ্ধ সার্বজনীন মহাজাগতিক নিয়মের সত্যিকার প্রকৃতি আবিষ্কার করেন এবং সকলকে এই নিয়ম মেনে চলার উপদেশ দেন। তিনি বলেছেন, যারা এ নিয়ম ভঙ্গ করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করবে এবং অনৈতিক জীবন যাপন কারবে তাদেরকে এর ফল ভোগের জন্য তৈরী থাকতে হবে। কেবল ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে কারো পক্ষে মহাজাগতিক নিয়মের প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই বিশ্ব বিধান পক্ষপাতহীন। তবু অনেক বেশী কুশল কাজ করে, মনকে প্রশিক্ষিত করে এবং মন থেকে অকুশল চিন্তা দূর করে অকুশল কর্মের প্রতিক্রিয়া বন্ধ করার শিক্ষা বুদ্ধ দিয়েছেন। মহাজাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এর প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। এই বিশ্ব বিধানের বিরুদ্ধাচরণ না করে এর সাথে বরং একাত্ম হয়ে সহযোগীতার মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করতে হবে।

মানসিক শক্তি

সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল জাং বুদ্ধ ব্যাখ্যাত কর্মবাদকে সমষ্টিগত চেতনা হিসেবে স্বীকার করেছেন। এটা মানসিক শক্তিতে কর্মবীজ গচ্ছিতকরণ ছাড়া কিছুই নয়। দার্শনিকদের মতানুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মধ্যে সমষ্টিগত চেতনা এবং 'বাঁচার ইচ্ছা' জাগ্রত থাকে, কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, পুনর্জন্ম হবেই। শারীরিক উপাদান সমূহের বিভাজন হতে পারে কিন্তু চিত্ত-প্রবাহ সহ 'বাচার ইচ্ছা' রূপান্তরিত হবে এবং সেই সমষ্টিগত চেতনা বা কর্ম অনুসারে একটি জীবনের উদ্ভব হবে।

নিউটনের মত আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণ ও 'শক্তির নিত্যতা' বুদ্ধ প্রবর্তিত কর্মবাদ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নীতি সমর্থন করে।

মানুষের দেবত্ব লাভ

বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। প্রজ্ঞা ও শক্তিতে মানুষ দেবতাকেও অতিক্রম করে। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের জন্য স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন। কেন ? কারণ বোধিলাভের মত উচ্চ উৎকর্ষতা অর্জনের প্রজ্ঞা ও বিশুদ্ধতা দেবতাদের নেই। এই মর্যাদা কেবল মানুষই অর্জন করতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিকেই উচ্চ আসনে অধিষ্টিত করে। অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে মানুষের অসামান্যতা স্বীকৃত। নূতন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের আছে। মানুষের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষতাকে বুদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি এর পরিপূর্ণতার পথ নির্দেশ করেছেন। মানুষের জন্ম শুধু দৈব-দুর্ঘটনা নয়। এর মূল কারণ তার নিজেরই কর্মফল। তাই বৌদ্ধধর্ম মানব জন্মের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা নেই। এজন্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সমুন্নত রাখা হয়।

মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তি অপরিসীম। মানুষের মানসিক ক্ষমতা অনেকদূর পর্যন্ত উন্নীত করা যায়। বৌদ্ধমতে মানুষের কোন প্রকার অতি প্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। সর্বজ্ঞতা লাভের স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বাইরের কোন অলৌকিক শক্তির সহায়তা ছাড়া বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেন।

বুদ্ধের মতানুসারে মানুষ, সে নিজে, যে কোন ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হোক না কেন, সুন্দর ও সঠিক ধর্মীয় জীবনযাপনের মাধ্যমে দেবত্ব পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম কৃপা লাভের জন্য মানুষকে

দেবতা বা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার উপদেশ দেয়।

তাঁরা আরো প্রচার করে যে মানুষ কেবল মৃত্যুর পরেই স্বর্গে যেতে পারে। এরকম স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা দেবত্ব পাওয়ার সুযোগ পাবে না। বুদ্ধ বলেছেন মানুষ এ জগতেই স্বর্গ সুখের স্বাদ পেতে পারে যদি সে মানুষ হিসেবে নিজের অবস্থানের অপব্যবহার না করে। বৌদ্ধ ধর্মে অবশ্য ঈশ্বর ধারণা অন্যান্য ধর্ম থেকে ভিন্ন।

মনের প্রকৃতি

বৌদ্ধ ধর্মে মন ও শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের দ্রুত পরিবর্তনের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুদ্ধের মতানুসারে খণ্ডিত সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে মানসিক শক্তির উদ্ভব হয় ও বিলয় হয়। জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত এবং মনোবিজ্ঞানও এই 'দ্রুত সঞ্চারী জীবন প্রবাহের' প্রকৃতিকে নিশ্চিতরূপে সমর্থন করে। জীবন তাই নিশ্চল বা 'রেডিমেড' কিছু নয়।

অপর একজন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস চেতনার সুক্ষ্ম সময় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন কিভাবে চেতনার উৎপত্তি হয় এবং কত দ্রত অনুক্রমে বিলীন হয়। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মনের অবিরাম ধারায় এটা সংঘটিত হয়, একটি চিন্তার উৎপত্তির সাথে সাথে এটা অন্য একটি চিন্তার জন্ম দেয় এবং এটার মৃত্যু হয়। এর পরিবর্তে যে চিন্তার জন্ম হল সেটা আবারো অন্য চিন্তার জন্ম দেয় এবং একইভাবে সেটার মৃত্যু হয়, এবং এই নিয়ম চলতে থাকে।

মানুষের মনে কিভাবে প্রথম কুচিন্তার উদয় হয়। এ প্রশ্নের উত্তরও বৌদ্ধ ধর্মে দেয়া হয়েছে। কুচিন্তার কারণ মানুষের স্বার্থপর অভিপ্রায় যা টিকে থাকে তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় বিলাসের লোভে।

অবারিত দ্বার

বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তাঁর সব বিষয় সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাঁর শিক্ষায় কোন গোপন বিষয় নেই। তাঁর জীবন ব্যাপী যে সব ঘটনা ঘটেছে সবই যেন একটা খোলা পুস্তক, তাতে কোন লুক্কায়িত বা রহস্যাবৃত বিষয় নেই। অন্য লোকেরা "অলৌকিক ক্ষমতা' মনে করে যেসব বিষয়কে সমীহ করে, বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে সেসব বিষয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। জগতের সকল কিছুই যদি প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তনশীল হয় তবে আমরা এগুলোকে কি করে 'অলৌকিক ক্ষমতা' বলব ? এমন কি বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মৃত্যুও স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয়। তিনি একজন সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষকের জীবন যাপন করতেন।

জীবনের বিকাশ

বুদ্ধ পশুত্ব থেকে মনুষত্বে এবং মনুষত্ব থেকে দেবত্বে – দেবত্ব থেকে ব্রহ্মত্বে এবং ব্রহ্মত্ব থেকে পরিপূর্ণ জীবনে বিকশিত হওয়ার ক্রমোন্নতির ধারা দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষ সরাসরি মহান নিষ্কলুষ জীবন থেকে পরিপূর্ণ পবিত্র জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারেন। এর বিপরীত ধারা ও তিনি দেখিয়ে গেছেন– তা হলো, মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বে নেমে আসা।

মধ্যপন্থী জীবন ধারা

প্রত্যেক ধর্মে নিজের আত্মা বা অন্তরকে পরিশীলিত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অমিতাচার ও আত্মনিগ্রহের চরমতা পরিহারই বৌদ্ধ পরিশীলনের বৈশিষ্ট্য। দুই চরম পথ– শাশ্বতবাদ ও বিনাশবাদ পরিহারই মধ্যপথ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপথ অনুসরণ করার জন্য বুদ্ধ সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেই এই মহান মধ্যপথের প্রকৃত অর্থ এবং এর উপকারিতা বুঝতে পারেন না। মধ্যপথের গভীর অর্থ জীবনের চরম

ও নরম পথ পরিহার করে সৎ জীবন যাপনের চেয়েও ব্যাপকতর। এর গভীরতর অর্থ হল কোনরূপ অপব্যবহার বা খারাপ কাজে নিয়োজিত না করে আমাদের ইন্দ্রিয়কে কিভাবে সবচেয়ে বেশী কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় সেই শিক্ষা গ্রহণ করা। কুশল চেতনা উৎপাদন এবং সৎ জীবন যাপন আমাদের নিজেদের এবং আমাদের চারিদিকে সকলের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং এভাবেই আমরা সকলে নিরাপদে ও শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারব। সকল ধর্ম অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই তাদের লোভ বাসনা চরিতার্থে ইন্দ্রিয়বিলাসে জীবন কাটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের লোভ এতই প্রবল হয় যে কিছুতেই তারা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না, একটা বদ্ধ আবেশের মধ্যে তারা সন্তুষ্টির পেছনে ধাবিত হয়। এ যুগের আধুনিক সমাজে অনেক অসামাজিক আচরণ, নিষ্ঠুর কার্যাবলী, মানসিক অশান্তি, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, উদ্বেগ ও বিক্ষোভ খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে– এ সবের মূলে রয়েছে অতৃপ্ত মন। এই অতৃপ্ত মনই অভ্যাস বশতঃ ইন্দ্রিয়কে অপকর্মে নিয়োজিত করে। এভাবে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ফলে মানব দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। এভাবে মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারের অথবা অত্যধিক অত্যাচারের চরম মূল্য দেয়। আমরা যদি ইন্দিয় বিলাসে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ি, তবে আমরা জীবন গঠনের জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন অথবা নূতন পৃথিবীর জন্য নিজেদের প্রস্তুতির কোন অবকাশ পাব না।

সুশীল জীবন

বুদ্ধ বলেছেন যে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন প্রাণীহত্যা খুবই নিষ্ঠুর ও অনৈতিক কাজ। কিন্তু কোন কোন ধর্মগুরু এই গুরুত্বপূর্ণ সহানুভূতিশীল বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। অন্য প্রাণীর জীবন সংহার করে তাদের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় নয় বরং মানুষেরাই অন্য সকল প্রাণীর জন্য আসল উৎপাতে পরিণত হয়েছে।

মানুষের মনে কতেক আজগুবি কল্পনার জন্ম দেয়া- মানুষের আবেগ

প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়া বা জাগতিক ইচ্ছা বা লোভ চরিতার্থ করা বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য নয়। বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য হল জীবন ও প্রকৃতিকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে চরম সুখ অর্জনের জন্য মানব জাতিকে সচেতন করে তোলা।

জীবনের স্বরূপ

জীবনের উদ্দেশ্য বড় জটিল বিষয় হয়ে পড়েছে, কেননা, বিভিন্ন ব্যক্তি এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য হল জীবনের সমস্যাবলীর পূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা। বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা এখনও মানুষের মানসিক বেদনা, ব্যর্থতা এবং জীবনের অতৃপ্তির প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি। তবে বৌদ্ধ ধর্ম এর পরিস্কার চিত্র তুলে ধরে পূর্ণ প্রতিষেধক ঘোষণা করেছে ঃ দুঃখের কারণ আছে, তদ্রূপ সুখেরও কারণ আছে।

প্রজ্ঞা কি

বৌদ্ধ দৃষ্টিতে প্রজ্ঞার ভিত্তি হল সঠিক বিবেচনা (সম্যক দৃষ্টি) ও সঠিক চিন্তা (সম্যক সংকল্প), জাগতিক নিয়মের উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির (প্রজ্ঞা) উন্মেষ। অন্তর্দৃষ্টির অর্থ শুধু সত্যকে জানা নয়, এটা জীবনের অতৃপ্তি থেকে পূর্ণ মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করাকেও বুঝায়।

সুতরাং সত্যিকারের প্রজ্ঞা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গণে, পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, এমন কি উপসনালয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের অন্তরেই প্রজ্ঞার অবস্থান। অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি, উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধিকরণ যখন সম্পূর্ণ হয় কেবল তখনই চরম পূর্ণতার মধ্যে প্রজ্ঞা আবির্ভূত হবে এবং অনুভূত হবে। জীবনের লক্ষ্য হল এই প্রজ্ঞা অর্জন। মহাশূণ্যে অনুসন্ধান না করে নিজের অন্তরের মধ্যে মহাকাশ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তবেই মানুষ শেষ লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে।

অগ্রগতির পথে সংসারের যেসব বিষয় বাধা সৃষ্টি করে, নিজের মনকে দৃঢ় ও পরিশুদ্ধ করে মানুষ সেসব বাধা-বিপত্তির প্রভাব জয় করতে পারে। এ স্তরে তখন অপশক্তির আর কোন কর্মক্ষমতা থাকে না।

বাস্তব পদ্ধতি

কোন এক দার্শনিক এই মত পোষণ করেন যে, ধর্ম মানুষের সকল অভিজ্ঞতার বিরোধিতা করে। বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু এই আদর্শের ধর্ম নয়, কেননা বুদ্ধ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সব রকমের শিক্ষা দিয়েছেন।

অনেক দার্শনিক, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিক জাগতিক জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভর করেন। তাদের মনের শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে তাঁরা অনেক নূতন বিষয়ের সন্ধান পান। তা সত্ত্বেও নিজের মনকে কলুষমুক্ত না করে তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে দৃশ্যমান জগতের সত্যিকার প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কোন কোন পণ্ডিতের বক্তব্যে আমরা অনেক সত্যের সন্ধান পাই, কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে থাকে শুষ্ক দর্শনের কথা, কারণ তাঁরা মোহ ও কল্পনাবিষ্ট মনে এসব করে থাকেন।

বুদ্ধ কিন্তু পরিশীলিত জ্ঞান ও করুণা সহযোগে তাঁর মেধা ও অন্তরকে পরিচালিত করেছেন। এভাবে তিনি সঠিক প্রেক্ষিতে কোন বিষয় উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা অর্জন করেন। এজন্য তাঁর শিক্ষা কোন সময় দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত হয়নি বরং মানুষের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বাস্তব পদ্ধতি হিসেবে চলতে থাকে। জীবন্ত প্রাণীর মুক্তির জন্যই ধর্ম, তাই পরমার্থিক অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরাত্মার নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের সীমাবদ্ধতার শূন্যতা পূরণের জন্য সকল ধর্মকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। ধর্ম ও নৈতিকতা অবিচ্ছেদ্য।

ধর্ম কি মানুষের উন্নতির অন্তরায়

অনেক বৈজ্ঞানিক, প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ধর্মের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন। তাঁরা বলেন ধর্ম মানুষের উন্নতির অন্তরায় এবং আজগুবি, কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে এবং বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যা নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে বৌদ্ধধর্ম এইসব ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভংগীতে

বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ধর্ম এবং এই ধর্মকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বুদ্ধ শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য জাগতিক সত্য প্রচার করেননি, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্যেরও সন্ধান দিয়েছেন। প্রকৃত সত্য চিরদিনের জন্য সত্য হিসেবে বেঁচে থাকে। কোন অবস্থায় সত্য যদি পরিবর্তিত হয় তবে একে সম্পূর্ণ সত্য বলা যাবে না। এজন্যে বুদ্ধ প্রকাশিত সত্যকে আর্য সত্য বলা হয়, এই সত্য মানুষকে মহত্বের পথে পরিচালিত করে। এই ধর্মে জীবনধারা সত্য ও ন্যায়ের মজবুত ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত, তাই চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বুদ্ধের বাণী চিরন্তন, সুস্থির। চিন্তাবিদেরা যখন বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারবেন তখন নিশ্চয়ই এই জীবন ধারাকে শ্রদ্ধা করবেন।

কোন ধর্মীয় মার্কা থাকুক বা না থাকুক, পূর্ণাঙ্গ জীবনের মহান জীবনধারা হিসেবে বুদ্ধের শিক্ষা আরো শক্তিশালী ধর্ম হিসেবে বেঁচে থাকবে। ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলো গ্রথিত হয়েছে। এমন কি কালের অতিক্রমণেও এই শিক্ষা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হবে না।

একটি উদার ধর্ম

বুদ্ধ অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মানুসারীদের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বাধা সৃষ্টি না করে বা পরিহাস না করে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে যথাযথ সহযোগিতা করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিরোধের উর্ধে থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য এ ধরণের উদার ও সমঝোতাপূর্ণ জীবনধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের শান্তি ও সহনশীলতার বাণী সত্যিই অসাধারণ। সহনশীলতা একটি গৌরবদীপ্ত গুণ। আজকের দিনে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একান্ত অপরিহার্য।

ধর্মের স্বাধীনতা

বুদ্ধের অনুসারীরা যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন কি অনেক বৌদ্ধ নিজেরাই তা বুঝতে পারেন না। কোন বিষয় আমরা গ্রহণ করব কি পরিহার করব এর বিচার বিবেচনা ও চিন্তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। ধর্মের নামে কোন কিছু গ্রহণ করতে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, হয়ত তা কোন মহান ধর্মগুরুর মহত্বকে স্মরণ করে অথবা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী বলে অথবা পুরানো আচার হিসেবে প্রচলিত হয়ে থাকলেও। বৌদ্ধেরা কোন উক্তি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যুক্তি বিবেচনায় নিসংশয় হলে তা গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা রাখে। বৌদ্ধেরা কখনো বলেন না যে এটা বা ওটা করা নিষিদ্ধ। তাঁরা বরং বলেন, এসব করতে তাঁরা পছন্দ করেন না কারণ এগুলো সাধারণের মধ্যে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বা উপদ্রব সৃষ্টি করে। অপরদিকে তাঁরা কিছু ভাল কাজ করেন ধর্মের নির্দেশ পালনের জন্য নয়, তাঁরা এসব ভাল কাজের মূল্য ও অর্থ উপলব্ধি করে নিজেদের ও অন্যান্য সকলের মঙ্গলের জন্য এসব করে থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ব্যক্তি স্বাধীনতার ধর্ম, এটা কখনও কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেনা যতক্ষণ না তা কোন অনৈতিক বা ক্ষতিকর বিবেচিত হয়। বৌদ্ধেরা ধর্মীয় নীতির সাথে সংগতি রেখে স্বাধীনভাবে পারিবারিক জীবন গঠন করতে পারে। বুদ্ধিজীবিদের জন্যও এই ধর্ম এক অমূল্য স্বর্ণখনিস্বরূপ এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা মনস্তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন নীতির গভীর দিকগুলো নিয়ে অর্থবহ গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন। বৌদ্ধ ধর্ম মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, – আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং অসন্তোষ ও অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য সর্বশেষ উপায়। এ জন্য ২৫০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে বৌদ্ধ ধর্ম কোন রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশে সকল মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। বুদ্ধের সময়ে তাঁর বাণীসমূহ শান্তি ও সৌহার্দ্যের, শুভেচ্ছার বার্তারূপে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সকল মানুষ আগ্রহসহকারে

স্বাগত জানিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাই কোন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে জোরজবরদস্তি ও বল প্রয়োগ না করে পৃথিবীব্যাপী তাঁরা এই ধর্ম প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার

বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা প্রবর্তকের মানবিক অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও বোধির আলোকে সকল কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তা কখনও দৈব প্রত্যাদেশ বা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে নয়। এই ধর্ম বিশ্বাস করে যে মানুষের সমস্যাবলী নিজের অভিজ্ঞতা ও পরার্থপরতার মাধ্যমে সহযোগী মানুষকেই তা বুঝতে হবে। মানবিক চিন্তার উন্মেষ ও মনের পরিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতে সহজে বুঝা যায় কেন লোকেরা বলে থাকেন, বৌদ্ধ ধর্ম মোটেই কোন ধর্ম নয়– এটা মানবতাবাদ।

তবে এটা সত্য যে মানবতাবাদ দিয়েই প্রত্যেক ধর্মের সূচনা হয়। বুদ্ধ কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে অন্যের ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেননি। তিনি ত্রাণকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আমরা নিজেরাই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারি, আমরাই আমাদের ত্রাণকর্তা।

এই অনন্য দৃষ্টিভংগীই বৌদ্ধ ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় গোঁড়ামি মুক্ত ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বুদ্ধ দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের কারণ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি পরম সুখের সন্ধান দিয়েছেন যা মানুষ নিজেদেরকে দুঃখমুক্ত করে ভোগ করতে পারেন। বাহ্যিক কোন শক্তি মুক্তি আনতে পারে না। মানুষ নিজের চেষ্টায় পরম সুখ–স্বর্গ সুখ পেতে পারেন।

ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক কিছুতেই আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য যা বৌদ্ধধর্মে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হল, অনিত্য (অস্থায়ীত্ব), দুঃখ (অসন্তোষ) ও অনাত্মা (নৈর্ব্যক্তিকতা)। এটা বুদ্ধের

অনন্য সাধারণ আবিষ্কার। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা বা মানসিক ক্ষমতার সীমবদ্ধতার জন্য খুব কম সংখ্যক লোকই এই মহৎ ও উন্নত শিক্ষা বুঝতে পারেন।

সমস্যার কারণ

মানবিক সমস্যাবলী ও যন্ত্রণার মূল কারণ বিশ্লেষণ বৌদ্ধ ধর্মের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের মতে প্রবল স্বার্থান্বেষী লোভের কারণে আমরা পার্থিব জগতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। তিনি বলেছেন, তিন প্রকারের লোভ শক্তি আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেমন অস্তিত্বের লোভ, ইন্দ্রিয় ভোগের লোভ ও অস্তিত্বহীনতার লোভ। এই তিন প্রকারের লোভই আমাদের অস্তিত্ব, পুনর্জন্ম ও হাজারো রকমের সমস্যা ও মানসিক অশান্তির কারণ। বুদ্ধের ব্যাখ্যাগুলোর সুগভীর অর্থ বুঝতে হলে খুবই যত্নসহকারে ও বিচক্ষণতার সাথে এগুলো বিচার করতে হবে, কেবল তখনই প্রকৃত উপলব্ধি আসতে পারে।

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদেরাও পৃথক সংজ্ঞা ব্যবহার করে এই তিনটি লোভ শক্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মাণ লেখক আর্থার সোফেন হাওয়ার এই তিনটি শক্তিকে যৌনতা, আত্মরক্ষা ও আত্মহত্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অষ্ট্রিয়ান মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েড এই বিষয়গুলোকেই কাম, আত্ম-প্রবৃত্তি ও মৃত্যু প্রবৃত্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েডের প্রখ্যাত ছাত্র কার্ল জাং বলেছেন, 'সহজাত প্রবৃত্তির উৎস থেকে সৃষ্টিশীল সকল কিছুর উদ্ভব হয়'। এভাবে বিখ্যাত চিন্তাবিদগণ আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের প্রকাশিত সত্যকে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু আমরা যখন এসব আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই বুদ্ধ তাঁদের সীমিত জ্ঞান অতিক্রম করে আরো কত গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।

দুঃখের কারণ ঃ প্রশ্ন ও উত্তর

এ জগত মৃত্যু, ক্ষয়, দুঃখ, শোক, বেদনা, হতাশা ইত্যাদি দুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধ বলেছেন জন্মই (জাতি) দুঃখের কারণ। জন্ম না হলে দুঃখ উৎপত্তির সুযোগ থাকে না।

প্রঃ জন্মের কারণ কি?

উঃ অবচেতন মনের প্রবাহের(ভবাঙ্গ স্রোত) সাথে মন ও শরীরের (নামরূপ) (ভব) সমন্বয়ে জন্ম হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে যেখানে ভব সেখানে জন্ম।

প্রঃ নামরূপের সৃষ্টি কিভাবে হয়?

উঃ তৃষ্ণা যুক্ত ভাবনা কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং নামরূপের জন্ম হয়।

প্রঃ উপাদান কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উঃ তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদানের উৎপত্তি।

প্রঃ তৃষ্ণা কিভাবে উৎপত্তি হয়?

উঃ বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণার উৎপত্তি।

প্রঃ বেদনা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উঃ স্পর্শের (চেতনার সাথে অবলম্বনের) কারণে বেদনার উৎপত্তি।

প্রঃ এই স্পর্শ কিভাবে হয়?

উঃ ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শের উৎপত্তি হয়।

প্রঃ ষড়ায়তন কিভাবে উৎপত্তি হয়?

উঃ নামরূপের সমন্বয়ে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়।

প্রঃ এই নামরূপ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উঃ সহেতুক বা অহেতুক বিজ্ঞানের (কর্ম বিপাক) প্রত্যয়ে নামরূপের সৃষ্টি হয়।

প্রঃ কিভাবে অহেতুক বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়?

উঃ সুপ্ত সংস্কারের কারণে এর উৎপত্তি হয়।

প্রঃ সংস্কারের জন্ম হয় কিভাবে?

উঃ অবিদ্যার কারণে সংস্কারের জন্ম হয়। অবিদ্যা তৃষ্ণার একটি অংশ।

তাই এটা পরিষ্কাররূপে দেখা যায় যে পুরো জন্ম প্রক্রিয়া বা উৎপত্তির ভিত্তি হল অবিদ্যা (অবিজ্জা)। তবে এই সূচনাকে মূল কারণ, আধিবিদ্যিক কারণ বা সৃষ্টি ধর্ম হিসেবে গণ্য করা যয় না কিন্ত হেতু হিসেবে এর মধ্যে ক্রমে অন্য লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। একটার উপর নির্ভর করে অন্য একটা উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই হেতু প্রত্যয়-- প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি। দৃশ্যমান সম্পূর্ণ বিষয়টা হল সংসার চক্র বা ভবচক্র। এই চক্রের যে কোন একটি প্রত্যয় অন্যটির সংযোগে নুতন একটি প্রত্যয় সৃষ্টি করে। এই প্রত্যয়গুলোকে (যেমন অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি) সংসার চক্রে বা জীবন চক্রের দ্বাদশ বাহু বা দ্বাদশ নিদান বলা হয়।

চক্রের এই বাহুগুলো অনুক্রমিকভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত। অতীত জীবনের পটভূমিতে আছে অবিদ্যা ও কর্মশক্তি (সংস্কার)। বর্তমান জীবনে আছে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্মপ্রবৃত্তি (ভব) এবং ভবিষ্যতে আছে পুনর্জন্ম ও আনুষঙ্গিক দুঃখ-কষ্ট (জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন ইত্যাদি)। এভাবে সংসার চক্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত হয় এবং অবিরামভাবে আবর্তিত হতে থাকে।

এখানে আমরা এমন এক ধর্মের সন্ধান পাই যেখানে প্রকৃত ধর্মীয় নীতিমালার অস্তিত্ব আছে যেসব নীতিমালার মৌলিক চিন্তাধারা অপরিবর্তিত রেখে যেকোন সময়ে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় রক্ষা করা যায়। তা সত্ত্বেও মানুষের এই ধর্মীয় নীতিমালার মূল্যায়নের ক্ষমতা কালক্রমে বেশ লোপ পেতে পারে। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে বাস করে মানুষেরা এই নীতিমালা অনুসরণে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু এই মূল্যবান সোনালী নীতিমালার মূল্য সকল সময়ে অমলিন হয়ে বেঁচে থাকবে এবং সর্বত্র পন্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করবে।

'বৌদ্ধধর্ম কেন ?' এবং কেন বৌদ্ধ ধর্ম এখনও বিশেষ করে এই আধুনিক যুগেও এত বেশী প্রয়োজন, আশা করি আলোচ্য ব্যাখ্যায় এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে।

নিবেদন

আপনার পরলোকগত পূজনীয় ব্যক্তির স্মৃতিতে ধর্মীয় বই প্রকাশ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবো। ধর্মীয় বই হউক সুশীল সমাজ গড়ার সহায়ক শক্তি।

চারুবালা বড়ুয়া
সভানেত্রী
প্রচার ও প্রকাশনা পর্ষদ
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

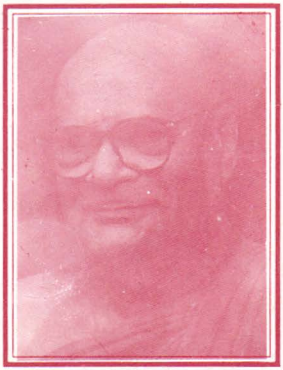

ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের

পরম শ্রদ্ধেয় ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের জে. এস. এম., পিএইচ. ডি., ডি.লিট, ১৯৩০ এর জুন মাসে মাত্র ১২ বছর বয়সে দক্ষিণ শ্রীলংকায় তাঁর জন্মস্থান কিরিন্ডিগ্রামে শ্রামণ হিসাবে দীক্ষা লাভ করেন। ভারতে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষে ১৯৫২ এ কুয়ালালমপুর মহাবিহারে থাকার আমন্ত্রণ পাওয়া পর্যন্ত তিনি ধর্ম প্রসারের কাজে সেখানে অবস্থান করেন।

তখন থেকে তিনি প্রধানত তাঁর মূল্যবান লেখনীর মাধ্যমে শুধু মালয়শিয়ায় নয়, পৃথিবীর সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি মালয়শিয়ার অন্যান্য ধর্মানুসারীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা বৃদ্ধির জন্যও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর কাজের অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনি শুধু তাঁর দেশ শ্রীলংকা নয, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেন।